SUPPLEMENT

বিশেষ ক্রোড়পত্র

অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) + সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

এ এক অভূতপূর্ব দিন

জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসবার পর ছোট্ট কামাল যখন তাঁকে পিতা বলে চিনতে পারেন নি, এবং তিনি সেটা বুঝতে পেরে ব্যথিত চিন্তে যখন কামালকে কোলে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, 'আমি তোমারও আব্ধা', তখন পুত্রসন্তানকে একথা বলবার সময় তাঁর বুক যে কতখানি ব্যথিত হয়ে উঠেছিল, সেটা হৃদয় দিয়ে বুঝে উঠলে আমাদের চোখ আবেগে বাম্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

রাজনীতিবিদদের জীবন যে আর দশটা মানুষের মতো নয়, সেটা তাঁর মতো করে আর কে বুঝেছিলেন?

ফলে তিনি যখন একদিন অজন্র সংগ্রাম শেষে এই দেশটির কর্ণধার হলেন , সামান্য ক'টি বছরই মাত্র তিনি কর্ণধার হতে পেরেছিলেন, তখন যুদ্ধবিদ্বস্ত একটি দেশ গড়ে তোলার কঠিন দায়িড় ও কর্তব্যের ভেতরেও তিনি শিন্তদের কথা ভোলেন নি, কারণ শিন্তদের ভোলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ তিনি নিজেই ছিলেন এর ভুক্তভোগী।

তিনি প্রয়াত হওয়ার একবছর আগে<mark>ই প্রণয়ন করেছিলেন শিত আইন। এই আইনে শিতদে</mark>র জন্য সর্বোন্তম ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর দূরদৃষ্টি এতই প্রখর ছিল যে তারই ধারাবাহিকতায় কিছু বছর পরে জাতিসংঘ প্রণয়ন করে শিণ্ড সনদ।

এর আগে জাতিসংঘে শিশু সনদ বলে কিছু ছিল না।

বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকাকালীনই শিশুর জন্মের পর তার প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা একটি শিশুর জন্য যে সবচেয়ে মূল্যবান শিক্ষা, এটা তিনি বিশ্বাস করতেন। এজন্য এ

আধানক নিকা আগত নিউয় জন্য যে গবচেয়ে মুখ্যমান নিকা, এটা নিবান বিশ্বান করতেন। অভন্য আ শিক্ষাকে তিনি বাধ্যতামূলক করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সর্বদাই ছিলেন জাতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। একটি শিন্তর মনোজগতকে গড়ে তুলে তার

তেওরে সাংস্কৃতিক চেতনাকে জায়ত করতে চেষ্টা করাই ছিল তাঁর মনোবাসনা। এই চেতনা যে একটি মানুষকে প্রঞ্জাবান করে তোলে, অন্যায় করতে বাধা দেয়, অনৈতিক কর্মকান্তকে পাশ কাটিয়ে চলে, এটি তিনি জানতেন ও বিশ্বাস করতেন। এবং সেই লক্ষ্যে তিনি কাজ করে গিয়েছিলেন।

জীবন্দশায় পিতা হিসেবে তিনি তাঁর শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন নি, এজন্য নিশ্চয় তাঁর মনে দুঃখবোধ ছিল। তাই হয়ত পরবর্তীকালে যখন তাঁর আজীবনের সংগ্রাম কিছুদুর সফল করতে পেরেছিলেন, সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে হাজার বছরের পরাধীন বাঙালিকে শৃঙ্গলমুক্ত করতে পেরেছিলেন, তখন তাঁর নিজের জন্মদিনটি ছোটো ছোটো শিশুদের সঙ্গেই কাটাতে তালোবাসতেন।

তাদের সঙ্গে হেসে খেলে কিছুটা সময় কাটিয়ে দিতেন। গণভবনের পুকুরটির ধারে বসে তিনি তাদের সঙ্গে গল্প কথকতায় সময় কাটাতেন।

হয়ত তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনের মধ্যে নিজের শিশুকালের স্মৃতির জাগরণ ঘটত। তাঁর ছেলেমানুষী নানা প্রকারের দুষ্ট্রমির কথা মনে হতো। বড়ো মানুষদের রাতের বেলা গাছের নিচে গায়ে সাদা চাদর জড়িয়ে ভূতের ভয় দেখানো, কোনো মানুষ গরিব ছাত্রদের জন্য এক মুঠো চাল দান না করলে গভীর রাতে তাদের ঘরের টিন্দের চালে দমাদম চিল ফেলে তাদের মনে অশরীরি ভীতির সঞ্চার করা, হয়ত তিনি তখন ছেলেবেলার এইসব ঘটনা ভেবে মনে মনে হাসতেন।

কিষ্ণ তাঁর সকল প্রকার দুষ্ট্রমির ভেতরেই ছিল একটি ক্রিয়েটিড চিস্তা। ছেলেবেলায় গরিব ও শিও ছাত্র– ছাত্রীদের লেখাপড়ার খরচ চালাবার জন্য একজন শিক্ষকের সহায়তায় তিনি গড়ে তুলেছিলেন "মুসলিম সেবা সমিতি।" সুতরাং নিজের শৈশব থেকেই শিশুদের গড়ে ওঠার ব্যাপারে তাঁর চিন্তা ভাবনা ছিল সক্রিয়।

স্কুলের লেখাপড়ার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতেও তাঁর উদ্যম ছিল লক্ষ্য করবার মতো।

সাহসিকতা ছিল তার ছেলেবেলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তঁর জীবিতাবস্থায় ১৯৭৪ সালে ২২ শে জুন শিশু আইন জারি করেন। এ আইনটি শিশু অধিকারের রক্ষাকবচ হিসেবে ধরা হয়।

শিতর জন্মের পর তার কিছু প্রাথমিক দায়িতৃও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রের কাঁধে অর্পন করেছিলেন। যুগান্তকরী এই চিন্তা সদ্য জন্ম নেওয়া একটি দেশের জন্য ভয়ানক একটি ঝুঁকির বিষয় ছিল। কারণ দেশের কাঠামো একটা ভাংচুর অবস্থায় ছিল। দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর অত্যাচারে দেশটি ছিল ছিন্নভিন্ন। কিন্তু তিনি ছিলেন অতিশয় সাহসী একজন মানুষ। শত বাধা বিপত্তি সত্বেও যে কাজটি আগে করতে হবে, সে কাজ তিনি আগেই করে ফেলেছিলেন।

তিনি ঘোষণা দিলেন যে শিন্তর প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব হবে সরকারের। এবং এই উপলক্ষ্যে তিনি ১৯৭৩ সালে প্রায় সাঁইত্রিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে রাষ্ট্রের দায়িত্বে অর্পন করলেন।

নানা সমস্যা জর্জরিত সদ্য জন্ম নেওয়া একটি রাষ্ট্রের পক্ষে সেটি ছিল একটি ভীষন সাহসী পদক্ষেপ। কিষ্ক এই যুগান্ডকরী সিদ্ধান্তই প্রমাণ করতে পেরেছে যে শিশুকে রাষ্ট্রের একজন সাবলীল নাগরিক হয়ে গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তাঁর এই দিব্য দৃষ্টি। একটি জাতির মেরুদণ্ড যে সেই জাতির শিন্ত- জনগণ এই দর্শনে বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশ্বাসী।

তিনি মনেগ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে আজ যে শিশু, কালই হয়ত হবে সে দেশের কর্ণধার। তাই শিশুদের ভবিষ্যৎ যেন নিশ্চিৎ এবং সুদৃঢ় হতে পারে, সেই লক্ষ্যে তিনি কাজ করে গিয়েছিলেন।

শিন্ধদের প্রতি জাতির পিতার এহেন দৃষ্টিভঙ্গিই পরবর্তীকালে আওয়ামী <mark>লীগ সর</mark>কারকে ১৭ মার্চ জাতীয় শিন্ধ দিবস হিসেবে পালন করতে উদ্বন্ধ করে।

বাংলাদেশে ছিন্নমূল শিন্ধরাও যেন তাদের নাগরিক অধিকার পায় তার জন্যও <mark>এই জাতী</mark>য় শিন্ড দিবস, ক্রমে

বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্র দর্শন

ঘোরে এটি তো কিতাবেও লেখা ছিল। সবাই যেহেতু এ<mark>টা বলছে</mark> আর সবাই যেহেতু এটা লিখছে তখন আর কিতাবে যেহেতু আছে সেটাই সবাই বিশ্বাস করছে। আসল সত্যটা হচ্ছে, সূর্য স্থির আছে, নয়, পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। এটা বলতে গি<mark>য়ে অনেকে</mark>র জীবন চলে গেছে। অতএব গণতন্ত্র করে বলতে সবাই যেটা বুঝে, এটা গণতন্ত্র না। অথবা বেশির ভাগ মানুষ যা বোঝে সেটা গণতন্ত্র না, হারি

যেটা ন্যায্য কথা, যেটি সত্য কথা, সেটাই গণতন্ত্র। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল গৃহীত হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করে। এরা ছিল আমাদের অভ্যন্তরীণ শত্রু। আন্তর্জাতিকভাবে হওয়ার পরদিন বঙ্গবন্ধু জাতীয় সংসদে ভাষণে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন: গুটিকয়েক দেশ ছাড়া সারা পৃথিবী আমাদের বিপক্ষে ছিল। চীন ছিল পাকিস্তানের সবচেয়ে "আমি চাই শোষিতের গণতন্ত্র, শোষকের নয়। এখনো মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। যে মানুষের বড়ো বন্ধু। আমেরিকারও একই অবস্থা। সৌদিআরবসহ মুসলিম দেশগুলো প্রায় সবাই কাপড় নাই, যে মানুষ বন্ধু খুঁজে পায<mark>় না, যা</mark>র বুকের হাডিড পর্যন্ত দেখা যায়, আমি জীবনভর এদেশে হত্যা, ধর্ষণ ও লুষ্ঠনকে সমর্থন করেছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমাদের এদের সঙ্গে থেকে সংগ্রাম করেছি। এদের পাশাপাশি রয়েছি। কারা নির্যাতন ভোগ করেছি। দেশ বিজয় লাভ করার মাত্র ৯ দিন আগের ঘটনা, ৭ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের আমার সহকর্মীরা জীবন দিয়েছে। তাদের দুঃখ দূর করার জন্য আমি একদিন এই হাউজে সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের পক্ষে বিপক্ষে ভোটাভুটিতে ১১০টা দেশ আমাদের বিপক্ষে বলেছি, আমরা শোষিতের গণতন্ত্র চাই [...] যারা রাতের অন্ধকারে পয়সা লুট করে, যারা বড়ো ভোট দিয়েছিল। সৌদি আরব আমাদের স্বীকৃতি দেয় ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট সন্ধ্যায়। বড়ো অর্থশালী লোক, যারা ভোট কেনার জন্য পয়সা পায় তাদের গণতন্ত্র নয়, শোষিতের প্রথমে নিশ্চিত হয় যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু'র দাফন কাফন সম্পন্ন হয়েছে, এর পরেই গণতন্ত্র। এটা আজকের <mark>কথা নয়,</mark> বহুদিনের কথা আমাদের।" আমাদের স্বীকৃতি দেয়। বিদেশি শত্রু যারা ছিল তাদের আবার শাখা প্রশাখা ছিল দেশের আমাদের জাতীয় পরিচয়টা কী হবে, আমরা এটা নিয়েও অনেক সময় বিতর্কে জড়িয়ে পড়ি। ভিতরে, যাদেরকে আমরা বলি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী। ১৯৬০ ও ৭০ এর দশকে যাদের সারা পৃথিবীব্যাপী প্রভাব ছিল। এদের বিভিন্ন সংঘবদ্ধ দল যেমন, পূর্ববাংলার কমুনিস্ট আমরা বাঙালি ছিলাম তারপরেও তো আমাদেরকে বাংলাদেশী করে দেওয়া হলো। শার্টি, সর্বহারা পার্টি, প্রত্যেকটা দল অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল এবং কোথাও কোথাও তারা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিগু হয়েছে। নোয়াখালীতে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করার জন্য এই সংঘবদ্ধ দলগুলো সক্রিয় ছিল। এই যে ত্রিপক্ষীয় শক্তি, দেশের অভ্যন্তরীণ দালাল, বিদেশী শক্তি এবং তাদের দালালরা সবাই আমাদের অগ্রসর চিন্তার বিপক্ষে ছিল। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ একদিকে সেনাবাহিনীর একটা দল চলে গেল শেখ মনির বাড়িতে, এক গ্রুপ চলে গেল আব্দুর রব সেরনিয়াবাদের বাড়িতে, অন্যদল চলে গেল ৩২ নম্বরে, একটা দল চলে এলো রেডিওতে। রেডিওতে যারা এলো তারা এসেই স্বাধীনতার স্রোগান 'জয় বাংলা'-কে নির্বাসিত করে পাকিস্তানী কায়দায় বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ঘোষণা করে, বাংলাদেশ বেতার হয়ে গেল 'রেডিও বাংলাদেশ'। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কেবলমাত্র রাষ্ট্র ক্ষমতা বদল করার একটা অভ্যুত্থান ছিল না। তথন বিভিন্ন দেশে প্রায়ই অভ্যুত্থান হতো, এই অভ্যুত্থানগুলোর কারণ ছিল রাষ্ট্রক্ষমতা বদল করা। সকালে একজন, বিকেল বেলা আরেকজন। তখন কমন একটা ব্যাপার ছিল ক্ষমতা দখল। পুরা বিশ্ব কোন্ড ওয়ারের আওতায় ছিল; রাশিয়ান বলয়, আমেরিকান বলয়; পাল্টা পাল্টি এগুলো ছিল।

শিশু অধিকার দিবস হিসেবে দেশ ও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে।

কিন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদের এখন স্বীকার করতে হবে যে বর্তমানে পৃথিবীর বাস্তবতা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হচ্ছে। আজ এ পৃথিবী শিশুদের জন্য একটি অনিরাপদ স্থান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। গাজায় আজ লক্ষ লক্ষ শিশু অনিরাপত্তায় ভূগছে। ইসরাইলের অনৈতিক যুদ্ধের কারণে এবং অমানবিকভাবে আক্রমণে আজ ফিলিস্তিনের গাজায় হাজার হাজার শিশু তাদের প্রাণ হারিয়েছে, এখনও হারাচ্ছে। খাদ্যের অভাবে তারা অপৃষ্টিতে ভগছে। নানা প্রকারের অসুখে ভূগছে। শিশুদেরও যে বড়োদের মত বেঁচে থাকার অধিকার আছে এই কথাটা যুদ্ধ লোভী মানুষেরা আজ মানতে নারাজ। আনেক বাবা মা নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে শিশু সম্ভানদের ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে। এক শ্বাপদ সন্ধুল পরিবেশে পৃথিবীর শিশুরা বর্তমানে অসহায় জীবনযাপন করছে। এবং বিশাল পরাক্রমী এক ধ্বংসকামী শক্তির কাছে পৃথিবী যেন আজ

জিম্মি হয়ে পড়েছে। এই পথিবী মানুষের কাম্য নয়। কোনোদিনও ছিল না।

সেই হিসেবে আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের অবস্থা ভিন্ন বলতে হবে। কারণ আমাদের বর্তমান সরকার শিগুদের সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। শিশুদের সার্বিক কল্যাণে দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রণয়ন করেছেন জাতীয় শিগুনীতি। দেশের প্রচলিত শিগু আইনকে বর্তমান যুগের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছেন। যার নাম শিগু আইন ২০১৩। মেয়েদের বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্যও প্রনয়ণ করেছেন আইন।

একটা সুন্দর ও সুষম সমাজ গড়ে তুলতে হলে শিন্তরাই হচ্ছে দেশের মানুষের মূল সম্পদ। তাদের গড়ে ওঠার ওপরেই সময় জাতি নির্ভর কুন্দর থাকে। দেশের বর্তমান সরকার মনে করেন জনগণের উজ্জল ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে একটি শার্ট রাংলাদেশ গড়ে ওঠার ওপরে। একমাত্র শিন্ডরাই পারবে বড়ো হয়ে ২০৪১ সালের ভেতরে একটি শার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছেন। গুধু লেখাপড়া নয়, তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশেও কাজ করে যাচ্ছেন। সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই সরকার বছরের প্রথম দিনেই শিন্ডদের হাতে তুলে দিছেন নতুন বই, প্রদান করছেন উপবৃত্তি। শিন্ডরা যেন নির্বিদ্ধে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশেও কাজ করে যাচ্ছেন। সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই সরকার বছরের প্রথম দিনেই শিন্ডদের হাতে তুলে দিছেন নতুন বই, প্রদান করছেন উপবৃত্তি। শিন্ডরা যেন নির্বিদ্ধে তাদের লেখাপড়া করতে পারে এই প্রচেষ্টা সরকারের। আমাদের দেশে শাধারণ মানুষেরা তাদের মেয়ে শিন্ডদের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে অপরিণত বয়সেই তাদের বিয়ে দিয়ে দেন। সেজন্য সরকার তৈরি করেছে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন। আবার যে সকল কর্মী মায়েরা তাদের ছোটো ছোটো শিন্ড সঙ্গে কেল-কারখানা, হাসপাতাল কিংবা গার্থেস্টেন্টন-এ কাজ করতে যান, তাদের শিশুদের দিনের বেলা দেখাশোনা করবার জন্য তৈরি করেছেন শিশ্ত শির্যাত্ব কেন্দ্র, ডক্ষ করেছেন পথশিও পুনর্বাসন কার্যক্রম ও ডে-কেয়ার সেন্টার। এছাড়ান্ড শিন্ডদের সঠিক বিকাশের লক্ষ্যে বিন্ডিন্ন রকমের সাংস্কৃতিক এবং বৃদ্ধিবুন্তিক চর্চা কার্যক্রম চালু করেছেন।

ন্তধু তাই নয়, বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিবস কে শিন্তদের জন্য উৎসর্গ করে ১৯৯৬ সাল থেকে ১৭ ই মার্চ জাতীয় শিন্ত দিবস হিসেবে পালন করে আসছেন।

এই দিবসের মূল দর্শন হচ্ছে শিহুদের প্রিয় মাতৃভূমিকে একটি নিরাপদ আবাসভূমিতে পরিণত করা।

নিজের মাতৃভূমির প্রতি শিশুদের আস্থা গড়ে তোলা। জাতির পিতার মানব কল্যাণের মহৎ আদর্শকে নিজের হৃদয়ে ধারণ করা ও বিশ্বাস করা। এবং পরবর্তী সময়ে সুজনশীল এবং গঠনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজের মাতৃভূমিকে বিশ্বের সমুখে গৌরবের সঙ্গে তুলে ধরা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের শিশুরা তাদের জীবনের চলার পথে সঠিক দিকনির্দেশনা পেলে মাতৃভূমির এই আদর্শ ও স্বণ্ন পুরণ করতে সক্ষম হবে।

আমাদের স্মরণে আছে ১৯৭১ সালে, আমাদের দেশ যখন পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর দাপটে নিম্পেষিত হচ্ছে, বাংলার মানুষ যখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রতিবাদে ক্রমে ফুঁসে উঠছে, তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ''বাংলাদেশের মুজির স্পৃহাকে কিছুতেই নিডিয়ে দেওয়া যাবে না। আমাদের তবিষ্যতের বংশধরেরা যাতে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে সম্মানের সঙ্গে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারে তার নিশ্চরতা বিধানের জন্য আমরা স্বাই প্রয়োজন হলে জীবন দিতে প্রস্তুত। তাই আমাদেরকে কেউ পদানত করতে পারবে না।"

বঙ্গবন্ধুর সেই ঘোষণাকে , তাঁর সেই মহান স্বপ্নকে বাংলার জনগণ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এবং বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও খেটে খাওয়া এবং দেশ প্রেমিক ও অনুগত শৃঞ্চলা রক্ষা বাহিনী মানুমের সহায়তায় স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্রে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে।

ভালো হতো যদি আমরা বঙ্গবন্ধুর পদাছ অনুসরণ করে সকলেই এই দিনটি আমাদের নিজ নিজ সংসারে বাড়ির শিত্তদের সঙ্গে উদযাপন করতে পারি। বর্তমান যুগে আমাদের সাধারণ মানুষ্বের জীবন একটি যান্ধ্রিক কলকজায় পরিণত হয়েছে। আমরা শত ইচ্ছা হলেও নিজেদের শিতদের সঙ্গে সেভাবে সময় কটাতে পারছি নে। তাদের সঙ্গে হাসি, খেলা, ছোটো ছোটো গল্পকথা বা ছোটো ছোটো উপহার দিয়ে আমরা তাদের মন ভরাতে পারছিনে। দৈনন্দিন জীবনের চাপে আমরা অনেক সময় ইচ্ছা না হলেও তাদের কচি মনে আঘাত দিয়ে বসে থাকি। আমরা নিজেরা এজন্য অপরাধবোধে ভূগি। তাই বছরের এই একটি দিন যদি আমরা আমাদের পরিবেশের শিশুদের জন্য ব্যয় করি, তাহলে আমরা নিজেদের মনের ভেতরেও অনেক খানি আস্থা খুঁজে পাবো। আমাদের শিশুদের এই উপলব্ধি দিয়ে ভরাতে পারব যে আমরা সর্বক্ষণই তাদের শুভ কামনা মনের মধ্যে ধরে রাখি।

ব্যাপারটা মোটেই কঠিন কিছু নয়, যদি সেভাবে আমরা চিস্তা করতে পারি।

তাছাড়া আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি অধিকাংশ শিশু মনে করে বাবা মায়েরা তাদের সেভাবে ভালোবাসেন না। তারা ভাবে যে তাদের বাবা মায়েরা মনে করেন একমাত্র ক্লাসে ফাস্ট- সেকেন্ড হওয়া ছেলেমেদেরই ভালোবাসতে হবে। এর ফলে তাদের মনের ভেতরে সর্বদাই ক্লাসের পড়ুয়া বন্ধুদের সঙ্গে একধারণের গোপন রেশারেশি চলতে থাকে। অনেকসময় তারা হীনমন্যতায় ভোগে। তার জন্য শিশু বয়স থেকেই তাদের মানসিক বিকাশ ব্যহত হয়। অনেক অবুঝ মাতাকে আমরা বলতে গুনেছি যে তারা শিশুদের একথা বলছেন যে, তুমি যদি এবার পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পার তাহলে তোমাকে আমি বেশি করে তালোবাসব। যা কিনতে চাইবে, তাই কিনে দেব।

এরকমের একটি ভ্রান্ত মেসেজ বাবা মায়ের কাছ থেকে আজকাল অনেক <mark>শিন্তই পে</mark>য়ে থাকে। যেটি তাদের শিশু মনকে ভয়াবহভাবে পীড়িত এবং বিকৃত করে তোলে।

অরেকটি ভয়াবহ ব্যাপার এই ঘটছে যে, স্কুলের ছেলেমেয়েদের মায়েদের ভেতরে একধরণের রেষারেষি বা পাওয়ার গেম। অমুকের ছেলে বা মেয়ে পরীক্ষায় তমুকের <mark>ছেলে বা</mark> মেয়ের চেয়ে বেশি মার্ক পেয়েছে বা বেশি ভালো করেছে, এতে করে অনেক মা মনে করে<mark>ন তার সন্তানে</mark>র বিজয়ের ভাগীদার তিনিও। তিনি তখন পরাজিত ছাত্রটির মায়ের ওপরে নিজের স্থানটিকে ধারণ করতে থাকেন।

জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে এইসব বাবা মায়েদেরও সুযোগ ঘটছে তখন নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তোলা।

ক্লাসের ফার্স্ট বা সেকেন্ড ছাত্রছাত্রী নয়, দে<mark>শের সকল</mark> ছাত্রছাত্রী, জাত ধর্ম এবং বাবা মায়ের পদবী নির্বিশেষে আমাদের বাংলাদেশের নাগরি<mark>ক। তারা</mark> সকলেই আমাদের আদরের ধন। কারণ তাদের সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার ওপরেই আমাদে<mark>র দেশ এ</mark>বং রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভরশীল।

সমাজে আজকাল যেসব শিক্ষিত এবং পদমর্যাদা ধারণকারী মানুষেরা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সরকারকে বা দেশবাসীকে সাহায্য করছেন, তাদের অধিকাংশই উঠে এসেছেন সমাজের গ্রাসরুট পর্যায় থেকে। তাঁরাই আজ আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের কর্মকর্তা। এটি কখনোই সম্ভব হতো না যদি না বঙ্গবন্ধু এই রাষ্ট্রটির তরুতেই এরকম যুগান্তকরী চিন্তা না করতেন।

অনেক ভালো হতো যদি আ<mark>মরা আমাদের বঙ্গবন্ধু</mark>র জন্ম দিনে নিজেদের বা নিজের না হলে পাড়ার শিতদের নিয়ে একটু হাসি গানে কথকথায় দিনটি কাটাতে পারতাম। তাহলে সেটাই হতো আমাদের বঙ্গবন্ধুর প্রতি জন্যদিনের কিছুটা হলেও শ্রদ্ধা নিবেদন।

আমরা এ পৃথিবীতে মাত্রই অল্প কিছুদিনের জন্য আসি। চোথের নিমিষে আমরা আমাদের অজান্তেই পার হয়ে যাচ্ছি যোজন যোজন পথ। অতিশয় বৃদ্ধ বয়সেও মানুষের মনে হবে এই তো সেদিনই আমার সব ছিল। আর এ<mark>খন কিছুই</mark> নেই! জীবনের চলার পথে তাই কিছুটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী রেথে পথ চলাটা ভালো।

তাহলে মানু<mark>ষ অনেক ক</mark>ষ্ট- দুঃখ ও আশাভঙ্গকে সহজভাবে নিতে শিখবে।

তাই জীবনের একটি দিন জাতীয়ভাবে যদি আমাদের শিশুদের জন্য ব্যয় করি তবে সেটা মোটেও কোনো অযৌক্তিক হবে না।

আমাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা দিয়ে এই নিবন্ধটির সীমারেখা টানতে চাই। আর সেটি হলো এই যে, আমাদের এই মহান স্থপতি, এই মহামানব, দেশের স্বাধীনতার পর মাত্র অল্প কিছুদিনই জীবিত ছিলেন। মাত্র ৫৫ বছর বয়সেই বিশ্বাসঘাতকের গুলিতে তার জীবনাবসান ঘটে। যেমন আড়াইশো বছর আগে ঘটেছিল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার। বাঙালি জাতিকে গৌরবের শিখরে পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁর অনেক কিছুই করবার ইচ্ছে ছিল, অনেক স্বণ্ন ছিল, কিস্তু সেগুলি বাস্তকে রূপান্তরিত করে ওঠার সময় পাননি। তবে সেজন্য জাতি এখন পিছিয়ে নেই। আইবট করসে জন্য শেয় ফার্বে উদ্দের্জ্যে নেয় প্রান্ধনি। তবে সেজন্য জাতি এখন পিছিয়ে নেই।

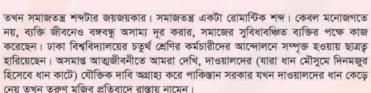
তাঁরই উরসে জন্ম নেয়া তাঁরই উত্তরসূরি সুযোগ্য কন্যা বর্তমানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি পিতার অসাধিত স্বপ্নকে আজ বাস্তবে রাপদান করার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করে চলেছেন। তাঁরই নেতৃত্বে দেশ আজ সদর্পে তার সমূদ্ধির ডালি নিয়ে সন্মুখের দিকে এগিয়ে চলেছে। বিশেষ করে নারী ফমতায়ন ও শিন্তর বিকাশে তাঁর সরকার প্রভূত উন্নতি করেছে।

তাঁর বর্তমান স্বপ্ন ২০৪১ সালের ভেতরেই নিজের মাতৃভ্মিকে পৃথিবীর বুকে একটি স্মার্ট দেশ হিসেবে গড়ে তোলা।

জয় শিশু দিবস।

আজ বঙ্গবন্ধু যেখানেই থাকুন না কেন, তিনি তাঁর এই সন্তানের হাসিমুখের অবর্ণনীয় পরিশ্রম নিজের চোখেই অবলোকন করছেন এবং প্রতিনিয়তই তাঁর এই সাধনাকে আশীর্বা<mark>দ করছেন</mark> এই বিশ্বাস আজ দেশবাসীর মনে জাগ্রত হয়েছে।

জয় শিশু দিবস। ব<mark>ঙ্গবন্ধুর জন্</mark>যদিন, শিশুর জন্য শপথ নিন। 🗆 লেখক : প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক



জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা সেটা ছিল সাম্যের বাংলাদেশ। সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রে মেহনতী মানুষের কল্যাণ এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব তা বঙ্গবন্ধুর মনে ১৯৫০ ও ৬০ এর দশকে জায়গা করে নেয়। সমাজতন্ত্র বলতে তিনি প্রধানত শোষণমুক্ত এবং বৈষম্যহীন একটা ব্যবস্থার কথা ভাবতেন। ১৯৫২ সালে চীন ভ্রমণের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে একটি সমতা ভিত্তিক রাষ্ট্রের পার্থক্য তিনি উপলব্ধি করেন। তা অসমাগু আত্মজীবনীতে লিখেছেন: 'তাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য হলো তাদের জনগণ জানতে পারল ও অনুভব করতে পারল এই দেশ ও এ দেশের সম্পদ তাদের। আর আমাদের জনগণ বঝতে আরম্ভ করল, জাতীয় সম্পদ বিশেষ গোষ্ঠীর আর তারা যেন কেউই নন (পৃ. ৩৩৪)।' বঙ্গবন্ধু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, শোষণমুক্তি এবং বৈষম্য দূরীকরণে সরকারের দায়িত্ব রয়েছে। চীনে গিয়ে তাঁর এই বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়। তোন দেখতে পান, কাভাবে চানে সামন্ততান্ত্রিক ভাম মালিকানা পারবাতত হয়েছে, ভূমিহীন কৃষক জমির মালিক হয়েছে - "আজ চী<mark>ন দেশ কৃষক-মজুরের দেশ। শোষক শ্রেণি শ</mark>েষ হয়ে গেছে।" নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে রাষ্ট্র কীভাবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রাপ্তির মৌলিক চাহিদার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করেছে (পৃ. ২৩০)। অনেক স্বপ্নই আমরা এখন দেখি, বঙ্গবন্ধু এতো স্বপ্ন দেখেননি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল মিলেমিশে বাংলাদেশ, ধনী-গরিব, পুরুষ-মহিলা, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সবাই মিলে সাম্যের বাংলাদেশ। সবাই মিলেমিশে থাকবো। বৈষম্যের কারণে অর্থনীতিতে একট<mark>া অরাজ</mark>কতা তৈরি হয় সেটাও আমাদের মনে রাখতে হবে। ক্যাসিনোতে যারা নিঃস্ব হয়ে যায় তাদেরকে ক্যাসিনোর মালিকরা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। আমরাও যদি এরকম ধনী হয়ে গেলাম, ধনী হতে গিয়ে সব কিছু কয়েক জনের হাতে চলে গেল, আমরা কেবল খেয়ে বেঁচে <mark>থাকলাম।</mark> আমার মনে হয় না যে জাতির পিতার স্বপ্লের সোনার বাংলা এটা ছিল। আর আমরা বলছি যে আয় বাড়ছে, বলছি ডলারের হিসেবে মধ্যম আয়ের দেশ, উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ ইত্যাদি। ইরাক, সিরিয়া, মিশর, অনেক আগেই ডলারের হিসেবে মধ্যম আয়ের দেশ ছিল। কিন্তু সেই দেশগুলো সেভাবে টিকে নেই। না টেকার কারণ হচ্ছে মতাদর্শগত ম্বন্দ্ব বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। যে স্বপ্ন নিয়ে জাতির পিতা স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃতু দিয়েছেন, যেই স্বপ্ন নিয়ে আমরা বাংলাদেশ করলাম যেটাকে বলি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। সেই চেতনা থেকেই যদি দুরে সরে যাই সেটা দিয়ে হয়তো উন্নয়ন হবে, কিন্তু টেকসই হবে না। যেটা ইরাক, সিরিয়া, মিশরের ক্ষেত্রে হয়েছে। অতএব আমি আবারও বলছি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বলতে কেবল ধনী বাংলাদেশ না। যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে জাতির পিতা একটা স্বাধীন সার্বভৌম আলাদা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি করলেন, সেটা ছিল সাম্যের বাংলাদেশ, অসাম্প্রাদায়িক বাংলাদেশ, মানুষে মানুষে ভালোবাসার বাংলাদেশ। সেখান থেকে কোনোভাবে আমাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না এবং সেটাই আমাদের অর্জন করতে হবে। দেশের শত্রুরা যারা একেবারে ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন থেকেই সব কিছুর বিরোধিতা করে আসছে, তারা কখনোই নির্দ্ধিয় হয়না। মাঝে মধ্যে দুর্বল হয়, এখানে সেখানে লুকায়, কিন্তু মনে রাখতে হবে এই অপশক্তি কখনই নিঃশেষ হয় না। নিঃসন্দেহে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধই সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। বাঙালি জাতি তার দীর্ঘদিনের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে নিজেদের জন্য একটি জাতি রাষ্ট্র গঠন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি কী হবে? ১৯৭০ ও ৮০'র দশকে জেনারেলরা ট্যাঙ্কের বলে সংবিধান ইচ্ছা মতো স্থগিত করেছে, সংশোধন করেছে। বাংলাদেশকে বানিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। বাংলাদেশকে উনুক্ত করে দিয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী গোষ্ঠীর কাছে, যারা বাংলাদেশের জন্ম এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দুটোই অস্বীকার করে। দেশের ও আশেপাশের মৌলবাদী আগ্রাসন রোধে এবং ক্রমবর্ধমান বৈষম্য দূর করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্লের রাষ্ট্র গড়তে আমাদেরকে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তাধারার কাছে ফিরতে হবে; বাংলাদেশকে তার দার্শনিক ভিত্তি- বাঙালিতু, অসাম্প্রদায়িকতা, সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজকে রাষ্ট্রীয় নীতির কেন্দ্রে নিয়ে আসতে হবে। 🗆



বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে যে দেশটা স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন, ১৯৭৫'র পর সে রাষ্ট্রটি ছিল না। এটা কেবল পুনরুদ্ধার করা হয় ১৯৯৬ সালে, পাকিস্তান থেকে আবার বাংলাদেশ। যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্বাধীন রাষ্ট্র চেয়েছিলেন, সেটার পুনঃজন্ম হয়। আমরা এখন একটা উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে যেরকম ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলা হয় তা হলো সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা। আমরা যে গণতন্ত্রের কথা বলি, সেটা বঙ্গবন্ধুর গণতন্ত্রের কথা। গণতন্ত্রের একটা সংজ্ঞা আছে যেটা অাব্রাহাম লিংকন দিয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর গণতন্ত্রের সংজ্ঞা যদি নেন তাহলে কিন্তু গণতন্ত্রের ভিতরে যে সমস্যাগুলি রয়েছে



সেগুলো চিহ্নিত করা যাবে। গণতন্ত্রই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা এটা বলা যাবে না। এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর নেই বলেই আমরা বলি এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। গণতন্ত্র বলতেই বুঝানো হয় সবাই যেটা বলবে অথবা মেজোরিটি লোক যেটা বলবে এটাই মেনে নেওয়া। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণের মধ্যে বঙ্গবন্ধু বলে গেছেন, একজনও যদি ন্যায্য কথা বলেন সেটা মেনে নেয়াই হচ্ছে গণতন্ত্র। বঙ্গবন্ধুর ভাষায় "...যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।" তাহলে গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটা কি হওয়া উচিং? গণতন্ত্র বলতে বঙ্গবন্ধু কি বুঝালেন? আমরা সনাতনভাবে গণতন্ত্র বলতে যা বুঝি, সবাই মিলে বা বেশিরভাগ লোকে যা ভালো বুঝি, সেটাই গণতন্ত্র। গৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনা আছে সবাই মিলে ভুল করছে। অধিকাংশ লোক বা সব লোক যেটা বলহে সেটাই সত্য? মানুষের মধ্যে সবাই মিলে যা বলে এটাকে সত্য হিসেবে ধরে নেওয়াদ্ব একটা প্রবণতা আদিকাল থেকে ছিল। সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে

ন, জাতির পিতা ১৯৭২ চীয়তাবাদের ভিত্তিতে দিয়েছিলেন, সে সংবিধান একটা স্তম্ভ হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি রেসকোর্সে যে ভাষণ দিয়েছিলেন "আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান" এই তিনটি পরিচয় <mark>অর্থাৎ বা</mark>ঙালি, মুসলমান, মানুষ এর সংমিশ্রনটা আমরা পেয়েছি। আমরা যে মুসলমান এটা<mark>র সাথে</mark> মরুভূমির মুসলমানের পার্থক্য আছে। বাঙালির সংস্কৃতি ও মানবিকতা মিশিয়ে আমাদের জাতির পিতা বলেছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা। যেটা দিয়ে আমি অন্যদের থেকে আলাদা হবো। কিন্তু ধর্মের মধ্যে যে মরু সংস্কৃতি ছিল সেটা পুরোটাই চলে আসছে। মরুভূমি থেকে ডলার আসছে, ডলারের সাথে সাথে চিন্তার মরুকরণ, ওখানকার কালচার, পোশাক, লেবাস, অবয়বে পরিবর্তন সব কিছুই আসছে। আজ যেটাকে মরু কালচার বলছি ষাট-সত্তরের দশকেও এরকম ছিল না। সন্তরের দশকে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পোশাক-আশাক, চেহারায় এত মেরুকরণ ছিল না। এখন মেরুকরণ ব্যাপকহারে বাড়ছে। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তার একটি অন্যতম ভিত্তি হলো অসাম্প্রদায়িক চিন্তা। বাংলাদেশ রাষ্ট্রেরও অন্যতম দার্শনিক ভিত্তি এটি। অসাম্প্রদায়িক চিন্তা আর বাঙালি জাতীয়তাবাদ একই সূত্রে গাঁথা। এটি সত্য, বঙ্গবন্ধু তরুণ বয়সে মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। জনসাধারণের দুঃখ লাঘব করতে তখন তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য লঙ্গরখানা খুলে কাজ করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেশে খাদ্যের অভাব দেখা দিলে, তিনি সুষম খাদ্য বন্টনের আন্দোলন, ভুখা মানুষের মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে কাজ করেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতায় মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। তরুণ মুজিব ছুটে বেড়ান দাঙ্গাকবলিত মুসলিম, হিন্দু দুই জনগোষ্ঠীকেই উদ্ধার করতে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়: "দু-এক জায়গায় উদ্ধার করতে যেয়ে আক্রান্তও হয়েছিলাম। আমরা হিন্দুদের উদ্ধার করে হিন্দু মহন্নায় পাঠাতে সাহায্য করেছি। মনে হয়েছে, মানুষ তার মানবতা হারিয়ে পশুতে পরিণত হয়েছে।" কলকাতায় তিনি হিন্দু, মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোককেই উদ্ধারের চেষ্টা করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার জন্য মহাত্মা গান্ধীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন সোহরাওয়াদী। সোহরাওয়াদীর সেই প্রচেষ্টায় তখন বঙ্গবন্ধুও যুক্ত হন। পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত হলেও বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক জীবনের প্রথম থেকেই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সুসংহত করেছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনা ছড়িয়েই। আবুল মনসুর আহমেদ, আতাউর রহমান খান মুসলিম বাঙালি জাতীয়তাবাদের ডিন্তিতে 'মুসলিম বাংলা' প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। অসংখ্য কমিউনিস্ট নেতাদের আমরা সেই মতাদর্শিক বিষয়ে কলম ধরতে দেখেছি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু পূর্ব-বাংলায় হিন্দু-মুসলিম বিভেদে রাজি ছিলেন না। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম বাঙালির সমর্থন পেতে কখনো হিন্দু বাঙালির বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি ও সংঘাতের রাজনীতি করেননি। বঙ্গবন্ধু পাকিন্তানি শোষকদের হাত থেকে বাঙালির মুক্তি আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়কে যুক্ত করেন। বাঙালির ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু ই প্রথম এবং সম্ভবত একমাত্র সফল নেতা যিনি হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়কে একত্রিত করেছেন। বঙ্গবন্ধু শ্রিজালির বিরুদ্ধে ঘৃণা সম্ভবত একমাত্র সফল নেতা যিনি হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়কে একত্রিত করেছেন। বঙ্গতঙ্গ বিরোধী বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে মুসলিমদের সমর্থন ছিলো না, আবার উচ্চ বর্ণের হিন্দু নেতারাও মুসলিমদের এইসব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যুক্ত হননি। বঙ্গবন্ধু এমনকি বাঙালিদের অন্য কোনো জাতির বিরুদ্ধে, যেমন বিহারিদের বিরুদ্ধে, সহিংস আচরণে প্ররোচাণা দেননি। বরং তাদের নিরাপস্তা দিতে ৭ মার্চের ভাষণে আওয়ামী লীগ কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন। "এই বাংলায় হিন্দু-মুসলিম, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িতু আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।" তিনি সকল জনগোষ্ঠীর সহাবস্থান এবং সব নাগরিকের সমান অধিকারে বিশ্বাস করতেন।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনে সাম্যের কথাটা এসেছিল সমাজতন্ত্র হিসেবে। তিনি দৃঢ়তাবে বিশ্বাস করতেন পুঁজিবাদী অর্থনীতি দর্শনগতভাবেই মানুষে মানুষে বিভেদ উদ্রেককারী। আর এইজন্য অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু বলছেন:

"আমি নিজে কমিউনিস্ট নই, তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসেবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যত দিন দুনিয়ায় থাকবে, তত দিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না। পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে বিশ্বযুদ্ধ লাগাতে বন্ধপরিকর। নতুন স্বাধীনতাপ্রাণ্ড জনগণের কর্তব্য বিশ্ব শান্তির জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করা। যুগ যুগ ধরে পরাধীনতার শৃঙ্গলে যারা আবদ্ধ ছিল , সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যাদের সর্বস্থ লুট করেছে- তাদের প্রয়োজন নিজের দেশকে গড়া ও জনগণের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মুক্তির দিকে সর্বশক্তি নিয়োগ করা।" লেখক: প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সাবেক ভিসি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়